।। সিনেমাটোগ্রাফি ঃ ভাবনা বনাম সৃজনশীলতা ।।

চলচ্চিত্রের সার্থকতা নির্ভর করে নিটোল দলগত সংহতির উপর । কারণ, চলচ্চিত্র একটা যৌথ শিল্প মাধ্যম। 'হিটবই'-এর অভিনেতা-অভিনেত্রী, কখনও কখনও পরিচালককে নিয়েও আমরা নাচানাচি করি । অবহেলিত র'য়ে যান এমন অনেক কলা-কুশলী, যাদের অবদান, দ(তা, শিল্প-মনস্কতা ছাড়া হয়তো ছবিটা 'ছবি' হয়ে উঠতো না । 'অশি(ত' চলচ্চিত্র দর্শকের এটাই চরিত্র ।

একটা চমকপ্রদ সত্য ঘটনা শোনানো যা'ক—একবার সিনেমাটোগ্রাফার সুব্রত মিত্রকে জাতীয় জুরি পদে সম্মানিত করা হয় । তিনি একটা ব্যাপার দেখে তো অবাক । —'আমি ল(্য করলাম শ্রেষ্ঠ নেপথ্য গায়ক-গায়িকাদের দেওয়া হচ্ছে দশ হাজার টাকা সম্মান মূল্য, আর শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রীকে দেওয়া হচ্ছে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা । আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলাম। আমি বললাম, গায়ক-গায়িকা ছাড়া ছবি তৈরী করা যায় । কিন্তু একজন সিনেমাটোগ্রাফার ছাড়া সিনেমা তৈরী করা যায় ? ওরা আমার কথা মেনে নিল । সেই থেকে শ্রেষ্ঠ সিনেমাটোগ্রাফার দশ হাজার টাকা পুরস্কার পাচ্ছে ।'

আলোকচিত্রায়ণ ছাড়া চলচ্চিত্রের কথা ভাবাই যায় না । আলো চলচ্চিত্রে, শুধু মাত্র চিত্রগ্রহণের জন্যই ব্যবহার করা হয় না । আলো চলচ্চিত্রে নিজের ভাষায় কথা বলে । আলোকচিত্রায়ণের ধারণা উপলব্ধি করার জন্য বিস্তারিত জানা দরকার আলোকচিত্র বিজ্ঞানের দুটো মৌল বিষয়—এক্সপোজার এবং সেনসিটোমেট্রি সম্বন্ধে ।

'এক্সপোজার' ঃ $\mathbf{E = I \times t}$—ফিল্মের উপর মোট আলোকপাতের পরিমাণ এবং সময়ের স্থিতিকালের গুণফলের প্রতিত্রি(য়া । আর ফিল্ম ডেভেলপমেন্টের পর এই প্রতিত্রি(য়ার বৈজ্ঞানিক পর্যবে(ণ পদ্ধতিকে বলে—'সেনসিটোমেট্রি'।

ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে হলে ফিল্ম এক্সপোজড করতে হয় । ফিল্ম এক্সপোজড করতে গেলেই এক্সপোজার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা উপলব্ধি করতে হবে । আমরা এমন এক্সপোজার ব্যবহার করবো, যাতে দৃশ্যের স্বাভাবিকতা বজায় থাকে। বিশেষ প্রতিত্রি(য়ার কথা আলাদা । প্রাথমিকভাবে আলোকচিত্রীকে দৃশ্যের স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে হবে । তারপর ছবির নান্দনিকতায় উত্তরণ ।

দিনের আলো, অর্থাৎ যে সময় সূর্যকে আকাশে পাচ্ছি, তার অসংখ্য বৈচিত্র্য । এটা শুধু প্রত্য(ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব । এই বৈচিত্র্য আবার নির্ভর করে বিশেষ পরিবেশের উপর । পাহাড় (বরফ/পাথর) সমুদ্র, শহর, গ্রামের আলোর চরিত্র কি একই রকম ? চিন্তা ক(ন তো উত্তর ও দ(ণ মে(র কথা ! সুব্রত মিত্রের পদ্ধতি—'প্রথমবার আমি লোকেশনে গিয়ে 'স্টীল' তুলে নিই । এর ফলে লোকশনের আলোর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় । এতে আমার কাজ করতে সুবিধা হয়।'

আলো দু'রকমের । বাইরের আলো । ঘরের আলো । আউটডোর । ইনডোর । —ইনডোর অর্থে কৃত্রিমতা । ভিন্ন পরিপ্রে(তে সৃজনশীলতা ।

দিনের বেলায় ঘরের মধ্যে দরজা-জানালা দিয়ে যেটুকু আলো আসে সেই আলোতে সুটিং করা প্রায় অসম্ভব । তাই প্রয়োজন হয় কৃত্রিম আলোর । অথচ দৃশ্যটা ফোটাতে হবে স্বাভাবিক ভাবে । এটাই সিনেমাটোগ্রাফারের চ্যালেঞ্জ । আর এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্যই প্রয়োজন আলোর উপর নিয়ন্ত্রণ ! যার উপর নির্ভর করে সিনেমাটোগ্রাফারের দ(তা এবং

সৃজনশীলতা । শুধু দৃশ্যটা স্বাভাবিক করলেই চলবে না । সেই সঙ্গে দৃশ্যটাকে করতে হবে ছবির অন্তর্নিহিত ভাবের, রসের সঙ্গী । যেহেতু চলচ্চিত্র, সিনেমাটোগ্রাফি, শিল্পমাধ্যম ।

বি(েবিখ্যাত ছবি 'পথের পাঁচালী'র একটা দৃশ্য—'দুর্গার মৃত্যু দৃশ্য' । বাইরে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে । ঘরের মধ্যে কুপির আলোতে মৃত্যুশয্যায় দুর্গা । মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে । ফলে, দৃশ্যটা যেমন স্বাভাবিক মনে হয়, আবার নান্দনিক দিক থেকেও ছবির ভাবের সঙ্গে সাযুজ্য গড়ে উঠেছে । 'জলসাঘর' ছবিতে ভোররাতে বি(েশ্বর রায় (ছবি বি(োস) পূর্ব পু(ষদের ছবির সামনে টলছে, ত্র(মে জানালা দিয়ে ভোরের আলো এলো । বাইরে তখন ঘোড়া ডাকছে । এরকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ।

প্র(ো হল, কীভাবে আলো নিয়ন্ত্রণ করে আমরা বাঞ্ছিত ফল পেতে পারি ?

প্রথমে জানতে হবে আলোর চরিত্র । আলো প্রধানত দু'রকমের । হার্ড লাইট আর সফট লাইট । হার্ড লাইট গাঢ় ছায়া সৃষ্টি করে আর সফট লাইট মৃদু ছায়া সৃষ্টি করে । আমাদের আরও জানতে হবে, কোন্ সময়ের জন্য কী ধরনের, কোন্ আলো ব্যবহার করবো । সূর্যের আলোর চরিত্র ল(্য করলেই সহজে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে । ল(্য করে দেখবেন তো ভোরের, সকালের, দুপুরের, বিকালের, সন্ধ্যাবেলার আলো কী ধরনের ছায়া সৃষ্টি করে ?

ঘরে দরজা-জানালা দিয়ে যে আলো ঢোকে, তারই কিছু অংশ দেওয়াল থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে । প্রতিফলনের পরিমাণ নির্ভর করে আলোর উজ্জ্বলতা, পরিমাণ এবং দেওয়ালের রঙের উপর ।

আলোকচিত্রায়ণের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের আলো । প্রধান আলো । কী লাইট বা মেইন লাইট আর কাউন্টার কী, ফিল লাইট বা ব্যালেন্স লাইট । এ ছাড়া ডাইমেনশন লাইট, ব্যাকগ্রাউন্ড লাইট, ইত্যাদি । মূলত সিনেমাটোগ্রাফির গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে বিভিন্ন ধরনের আলোর বৈশিষ্ট্য, বৈপরীত্যের বিন্যাস, সংঘাত ও সমন্বয়ের মধ্যে ।

ক্যামেরা আলো নিয়ন্ত্রণ করে অ্যাপার্চার এবং শাটার নামক দুটো যন্ত্রাংশ দিয়ে । মুভি ক্যামেরার শাটারের সাধারণত একটা নির্দিষ্ট গতি ১/৪৮ সে. বা ১/৫০ সে. থাকে । এবং প্রতি সেকেন্ডে চব্বিশটা ফ্রেম তোলা হয় । ফলে, সাধারণ অ্যাপার্চার নিয়ন্ত্রণ করেই মুভিক্যামেরা আলো নিয়ন্ত্রণ করে ।

কবিতা লেখা, আবৃত্তি করার জন্য যেমন প্রয়োজন ছন্দবোধ, শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ (গান বোঝার জন্য যেমন প্রয়োজন রাগ-রাগিণী, সুর ও স্বর সম্বন্ধে ধারণা এবং কান (সঠিক আলোকচিত্রায়ণের জন্য প্রয়োজন দৃষ্টি, এক্সপোজার, ফিল্ম, ডেভেলপমেন্ট, এবং সেনসিটোমেট্রি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা । সেনসিটোমেট্রিকে বলা যেতে পারে আলোকচিত্রায়ণের রাগ-রাগিণী । সিনেমাটোগ্রাফার সুব্রত মিত্রকে প্র(ো করেছিলাম—আলোকচিত্রের সঙ্গে কি সংগীতের কোন সম্পর্ক আছে? আলোকচিত্রায়ণে আলোর স্তর বিন্যাস কীভাবে করা হয় ? কীভাবে ছবির টোনাল কনটিনিউইটি বজায় রাখা যায় ?

প্র(ো শুনে সুব্রতবাবু আমাকে প্র(ো করলেন—'আলোর তো হাজার হাজার স্তর আছে । আপনি ক'টা স্তর কনসিডার করবেন ?' আমার উত্তর— সংগীতের সরগমের মত সাতটা । সুব্রতবাবু বললেন—'আপনি ব্যাপারটা আমাকে বোঝাতে পারেন ?' আমি আমার মত করে বললাম । সুব্রতবাবুর মন্তব্য—'আপনি ঠিক বলেছেন । এটা ছিল একবার পুনাতে আমার সেমিনারের বিষয় । আমি ওদের—ছাত্রদের বললাম, এখানে ওখানে মিটার রিডিং (এক্সপোজার রিডিং) নিয়ে কিছু হবে না। সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা নিয়মের মধ্যে আনতে হবে ।' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সুব্রত মিত্র নিজে সেতার বাদক । 'পথের পাঁচালী'র মিঠাইওয়ালা চিনিবাসের অসাধারণ দৃশ্যটার আবহসংগীত তাঁরই রচনা । একটা অনুষ্ঠানে রবিশংকর—'জানতো অনেক সময় তোমার আবহসংগীতের কথা বেমালুম চেপে গিয়ে ত্রে(ডিটটা আমি নিয়ে নিই'—একথা বলে ভারি লজ্জায় ফেলে দিয়েছিলেন তাঁকে । সুব্রতবাবু হাসতে হাসতে আমাকে বললেন ।

আমি সেনসিটোমেট্রিকে বলেছি আলোকচিত্রায়ণের রাগ-রাগিণী । সেই সঙ্গে আরো বলেছি, হাজার হাজার আলোর স্তরকে আমি ভাগ করবো মাত্র সাত ভাগে । এর ফল কী দাঁড়াচ্ছে সেটা একটু ল(্য করা যাক ।

নিয়মিত স-র-গ-ম চর্চা করলে, রাগ-রাগিণী চর্চা করলে যেমন সংগীতের রূপ প্রকাশ, ভাব ও রস সৃষ্টি করতে

কোন অসুবিধা হয় না, তেমনি সেনসিটোমেট্রি আয়ত্ত করলে আলোকচিত্রে বাঞ্ছিত ফল পেতে অসুবিধা হবে না। আগেই বলেছি আলোর সাতটি স্তরের দ্যোতক 'স-র-গ-ম'। যেমন ইস্টম্যান কোডাক 400 ISO ফিল্ম কে f/4 তে (At—24 frames per second (FPS) 175^0 Shutter opening. Shutter Speed 1/50) 12, 25; 50, 100; 200, 400, 800, ফুট ক্যান্ডেল (F.C) আলোকপাতে এক্সপোজড করে কোডাক নির্দেশিত ডেভেলপারে সঠিক ভাবে ডেভেলপ করলে আমরা সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি আলোক-স্তরবিন্যাস পাবো। আবার অ্যাপার্চার পরিবর্তন করে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আলো দিয়ে বর্ণ সপ্তক সৃষ্টি করা যাবে। যেমন, আমরা যদি 100 ফুট ক্যান্ডেল (F.C) আলোতে f/16, f/11, f/8, f/5.6, f/4, f/2.8, f/2 দিয়ে এক্সপোজড করি তাহলেও বর্ণ সপ্তক পাবো। সব ে(ত্রেই অবশ্য পরী(া-নিরী(া করে জেনে নিতে হবে বিভিন্ন মানের ফিল্মের ে(ত্রে বিভিন্ন পরিমাণ আলোকপাতে এবং বিভিন্ন অ্যাপার্চার ব্যবহারের ফলে ভিন্ন ভিন্ন আলোক-স্তরবিন্যাসের চরিত্র এবং প্রকৃতির আলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যের ব্যাপার। এই বিষয়টা আয়ত্ত করতে পারলেই ছবির যে কোনও দৃশ্যের শিল্প সম্মত আলোকচিত্রায়ণ করা যাবে।

এবার আমরা আর একটু এগিয়ে আলোর সাতটা স্তরকে মাত্র তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি চিত্রশিল্পের প্রথা অনুযায়ী। সা, রে, গা—আন্ডার, 'মা'—সঠিক, (অর্থাৎ 'গ্রে'-টোনের, নেগেটিভ ডেনসিটির একটা নির্দিষ্ট মাত্রা।) আর পা, ধা, নি-ওভার এক্সপোজড অঞ্চল। অর্থাৎ সেনসিটোমেট্রি অনুযায়ী 'D Log E Curve' এর 'D-Min' থেকে, 'D-Max' অঞ্চল। এবং সা, রে, গা 'Threshold' থেকে 'Toe' এবং 'মা'—'Straight Line' এবং পা, ধা, নি 'Shoulder' থেকে 'D-Max' Portion.

সেনসিটোমেট্রিকে লিখিত ভাবে প্রকাশ করা যত সহজ, বাস্তব প্রয়োগ কিন্তু ততোধিক জটিল। কারণ, সেনসিটোমেট্রি বহু বিষয় সমন্বিত জটিল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। বাস্তবে গাণিতিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রায় অসম্ভব। সেনসিটোমেট্রির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলি—Light, Subject Brightness, Transmission, Opacity, Density, Filmspeed, Developer, Time, Temperature, Anti-fog agent ইত্যাদি। তবে, সেনসিটোমেট্রি-র নিজস্ব কিছু অসুবিধা থাকলেও সেনসিটোমেট্রি পর্যবে(ণ করে আমরা আলোকচিত্রায়ণ সম্বন্ধে এমন এক উপলব্ধির স্তরে যেতে পারি, যেটা অবলম্বন করে অনায়াসে সৃজনশীল কাজ করা যায়, মনে করি।

গৌতম ঘোষ পরিচালিত 'অন্তর্জলী যাত্রা' ছবির দুটো দৃশ্য আলাচনা করি।

সীতারাম আর যশোমতী চাঁদের আলোয় চাঁদোয়ার তলায় শুয়ে আছে। চাঁদোয়ার ছিদ্র দিয়ে চাঁদের আলো ওদের মুখে, গায়ে ঘুরছে বাতাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। অপূর্ব দৃশ্য। কিন্তু ল(ণীয়, বাইরের চাঁদের আলো আর চাঁদোয়ার ফুটো দিয়ে আসা চাঁদের আলোর উজ্জ্বলতা কিন্তু এক হয়নি। বেশী হয়ে গেছে। অর্থাৎ আলোর স্তর সপ্তককে এক সুরে সঠিক ভাবে বাঁধতে পারেননি গৌতমবাবু। আর একটা দৃশ্য— চিতার সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেটা কাঁদছে। চিতার আলো ওর গালে এসে যে 'হাইলাইট' সৃষ্টি করেছে তার উজ্জ্বলতাও কিন্তু চিতার আলোর সম অনুপাতে মেলাতে পারেননি। ফলে, আলোকচিত্রায়ণের কৃত্রিমতা সৃষ্টি — স্বাভাবিকতা র(া করতে পারেননি।

তাই সার্থক আলোকচিত্রায়ণের জন্য একান্তভাবেই প্রয়োজন সেনসিটোমেট্রি পর্যবে(ণ করে প্রাকৃতিক আলোর স্তর সপ্তককে ছবির ভাবনা এবং দৃশ্য অনুযায়ী বিশেষ সুরে বাঁধা। তা না হলে আলোকচিত্রায়ণ, ছবির পরিবেশ, প্রকৃতির সঙ্গে সুর মেলাতে পারবে না। দৃশ্যের স্বাভাবিকতা এবং ধারাবাহিকতা র(া করা যাবে না।

প্রকৃতি পর্যবে(ণ করে জেনে নিতে হবে প্রকৃতির নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট পরিবেশের আলো-ছায়ার পার্থক্য, কনট্রাস্ট রেশিও এবং সেনসিটোমেট্রি পর্যবে(ণ করে জেনে নিতে হবে সরগমের কোন্ স্বর, আলোর কোন্ স্তর নির্দিষ্ট পরিবেশের কোন্ সময়ের আলোর দ্যোতক। এটা উপলব্ধি এবং আয়ত্ত করতে পারলে প্রকৃতিকে ফিল্মে বন্দী করতে আমাদের তেমন অসুবিধা হবে মনে করি না। অসুবিধা হবে না নিজস্ব ভাবনার আলোকচিত্রায়ণে। ভেঙে যাবে গাণিতিক নিয়ম কানুনের বেড়াজাল। উন্মোচিত হবে সৃষ্টির নব দিগন্ত।

'গ্রেগ টোলেন্ড' ছিলেন 'সিটিজেনকেইন'-এর ক্যামেরাম্যান । তিনি দেখলেন 'ক্যাট ওয়ার্ক'-এর আলোয় ঘরের ছাদ ঢাকা পড়ছে । তখন 'ক্যাট ওয়ার্ক' থেকে আলোর সরঞ্জাম নিচে নামানো ছাড়া আর কোন উপায় রইল না—তাতে জানালা অথবা দরজা দিয়ে যে পরিমাণ আলো আসতে পারে, সেই পরিমাপকে ভাবা হ'লো । স্বাভাবিকভাবেই সারা ছবিতে আলো হ'য়ে পড়লো বাস্তব ঘেঁষা পরিবেশ অনুসারী ।

পথের পাঁচালীতে সুব্রত মিত্র এইভাবেই আলো করলেন । রচনা করলেন সাদা-কালোর পাঁচটি স্তরের (Grey scale) গভীর বৈষম্য (High Contrast) । গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে আলো করার রীতি এদেশে কোন কালেই ছিল না । তা-ও হ'লো । প্রকৃতিকে বৈচিত্র্যময় করে তোলার জন্য ব্যবহার হলো— Filter 8N5/5N5 । আর আমাদের পরিচিত সেই 'বায়োস্কোপ' যেখানে একটা গল্পকে বলে দেওয়া হতো কিছু চরিত্র আর তাদের সংলাপের সাহায্যে । যেখানে ক্যামেরা এবং পরিচালনা ছিল দুটো স্বতন্ত্র বিষয় । কম্পোজিশান ছিল শুধু মসৃণ আলোতে ক্যামেরার অর্থহীন কায়দা । এমন কী আমরা দেখতে পেতাম ঘরের মধ্যে একটা লোকের বহু ছায়া অথবা ছড়ানো-ছেটানো আলো অন্ধকার । এই প্রতিটি ব্যাপারের একেবারে বিপরীত মে(তে এসে দাঁড়ালো পথের পাঁচালী । সত্যজিৎ রায় আমাদের বোঝালেন 'চৈত্রের প্রথম বৃষ্টিতে ভিজে দুর্গার অসুখ । সেই থেকে হরিহরের ফিরে আসার দিন পর্যন্ত ঘটনাগুলি সবই মেঘলা দিনে তোলা হবে । বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে যে রোদ হয় না তা নয়—কিন্তু উপন্যাসের এই অংশের যে নিরবচ্ছিন্ন ভারাত্র(ান্ত মুড, ছবির আলোতে তার প্রতিফলন মেঘলা দিনে সুটিং ছাড়া সম্ভব নয় ।'

অথবা যে দৃশ্য ছিলো 'অপু গাঢ় রঙের চাদর গায়ে কেরোসিনের খালি বোতল হাতে, বগলে ছাতা নিয়ে রাস্তা দিয়ে দূরে চলে যায় ।' —এই শটটাতে অপুর নিঃসঙ্গ অসহায়তা ফুটিয়ে তোলার জন্য খোলা মাঠের পরিবেশে লংশট । ঠিক এই মেঠো পথ দিয়েই এক বছর আগে অপুকে দুর্গার হাত ধরে পাঠশালায় যেতে দেখানো হয়েছিল,—সুতরাং দুর্গার অভাবটা দর্শকদের কাছে আরো প্রকট হয়ে ওঠে ।

আমাদের দেশে কখনোই আলো দিয়ে সাদা-কালো সুকুমার শিল্প রচিত হয়নি, পথের পাঁচালীতেই তার সূচনা । আমরা বুঝলাম একটা 'ক্লোজ আপ' কিংবা 'লংশট,' শুধু দৃশ্যটিকে সুখপ্রদ করার জন্য নয়, দৃশ্যটির মূল বক্ত(ব্যকে বোঝাতেও সাহায্য করে । এবং সত্যজিৎ রায় দিনের কোন একটা সময়ের আলোকে চরিত্রের মানসিক ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহার করলেন । আগে পর্দার সবটা জুড়ে থাকতো শুধু অভিনেতার চলন, বাক্যবিন্যাস, সুটিং এর সময় মেঘ এলে ক্যামেরা হতো বন্ধ । পথের পাঁচালীতে পর্দা জুড়ে রইল পরিবেশ । পরিমাপ করা হ'লো লণ্ঠনের আলোর দূরত্ব । একই দৃশ্যে দেখা দিল রোদ এবং মেঘ। বলে দেওয়া হ'লো ঋতু । রচিত হ'লো জীবন এবং মৃত্যুর যৌথ প্রতিকৃতি ।'

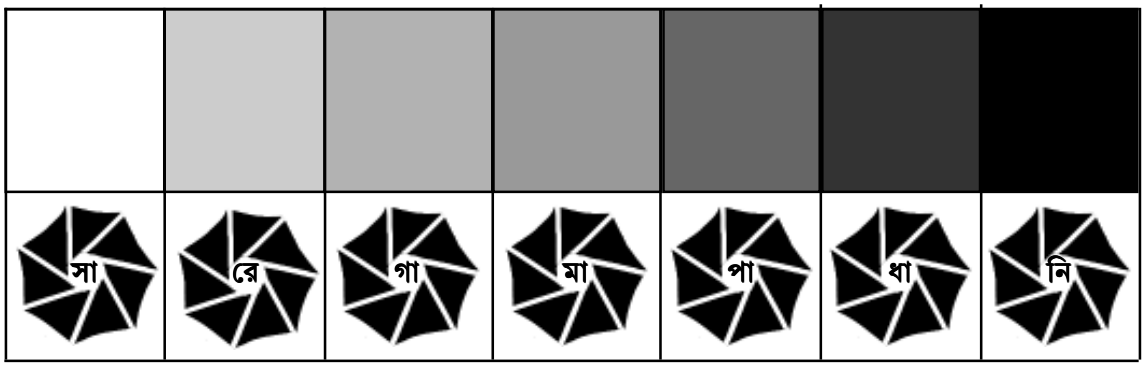

।। সাধারণ সেনসিটোমেট্রি ।।

ফোটোগ্রাফিক উপাদান, যেমন ফিল্ম, পে-ট, পেপার ইত্যাদির সংবেদনশীলতা পরিমাপ করার বিজ্ঞানকে 'সেনসিটোমেট্রি' বলা হয় । ফোটো-ইমালশানের উপর এক্সপোজার এবং ডেভেলপমেন্টের ফলে যে-বৈপ-বিক পরিবর্তন হয়, তারই বৈজ্ঞানিক বি(-ষণ, পরিমাণগত পরিমাপের নাম 'সেনসিটোমেট্রি' ।

১৮৭৪ সালে সেনসিটোমেট্রি সম্বন্ধে প্রথম আলোকপাত করেন এ্যাবোনি । ১৮৯০ সালে সেনসিটোমেট্রির পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন হার্টার এবং ড্রাইফিল । যে লগ রেখাচিত্র দিয়ে তাঁরা নেগেটিভের প্রকৃতি, চরিত্র ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁদের নামানুসারে রেখাটির নাম রাখা হয়েছে এইচ. ডি. কার্ভ (H. D. Curve) । যেটা ক্যারেকটারিস্টিক কার্ভ বা 'ডি লগ ই কার্ভ' নামেও পরিচিত ।

কোন বস্তুর উপর আলো পড়লে, বস্তুর সব অংশ সমানভাবে আলোকিত হয় না । আবার বস্তুর সমস্ত অংশের রঙ এক না হলে আলো প্রতিফলনের পরিমাণও এক হবে না । ফলে, বস্তুর ছবি তোলার সময় যে-এক্সপোজারই ব্যবহার করি না কেন, নেগেটিভে, পজিটিভে তার যে প্রতিত্রি(য়া হবে, তারই বৈজ্ঞানিক পর্যবে(ণ, বি(-ষণের জন্য প্রয়োজন সেনসিটোমেট্রি। সেনসিটোমেট্রি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে একজন আলোচিত্রশিল্পী কখনই তাঁর কল্পনার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবরূপ ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না । ফলে, যাঁরা সত্যিসত্যি ভাবনাকে সঠিকভাবে আলোকচিত্রে রূপ দিতে চান, তাঁদের কাছে সেনসিটোমেট্রি চর্চ্চার গু(ত্ব দিন দিন বাড়ছে ।

বস্তুর আলোকিত অংশের পাশেই অন্ধকার বা ছায়া অংশ থাকে । আলো-ছায়ার মধ্যে থাকে মধ্যবর্তী একাধিক আলোর স্তরবিন্যাস । বস্তুর সর্বাধিক এবং সর্বনিম্ন উজ্জ্বল পরিসরের অনুপাতকে বলে ঔজ্জ্বল্যের পরিসর, কনট্রাস্ট রেশিও । আবার একই বস্তুর মধ্যে থাকতে পারে বিভিন্ন রঙ । কোন নির্দিষ্ট ফিল্মে, কোন আলোয়, কী এক্সপোজার ব্যবহার করলে, কী ধরনের ডেভেলপার কত(ণ ব্যবহার করলে, কী ধরনের আলোর স্তরবিন্যাস, বর্ণবৈচিত্র্যের সৃষ্টি হবে, সেটা উপলব্ধি করা যায় সেনসিটোমেট্রি অনুশীলনের মাধ্যমে ।

সেনসিটোমেট্রি একাধিক জটিল বৈজ্ঞানিক বি(-ষণ । এটা নির্ভর করে একাধিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর । ফলে, সবসময় সেনসিটোমেট্রি আমাদের নিখুঁত কোন বৈজ্ঞানিক চিত্র উপহার দিতে না পারলেও, যে ধারণা আমাদের সামনে উপস্থাপন করে তার উপর নির্ভর করে সৃজনশীল কাজ করা যায় ।

সেনসিটোমেট্রি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে সবচেয়ে জ(রী বিভিন্ন ফোটোগ্রাফিক উপাদান পরিমাপের বিভিন্ন 'একক'-এর সংজ্ঞা ।

এক্সপোজার—আলোক সংবেদনশীল পদার্থের উপর মোট আলোকপাত এবং স্থিতিকালের গুণফলের পরিমাণ ।
E = I x t

ট্রান্সমিশন—নেগেটিভের কোন অংশের ট্রান্সমিশন, যে পরিমাণ আলো নেগেটিভের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে এবং যে পরিমাণ আলো নেগেটিভের উপর ফেলা হয়েছে তার অনুপাত ।

অর্থাৎ **T = It / Ii**

It — নেগেটিভের মধ্যে দিয়ে প্রেরিত আলো ।

Ii — নেগেটিভের উপর আপতিত আলো ।

ট্রান্সমিশনের মান সবসময় আপতিত আলোর পরিমাণ থেকে কম হবে । এবং ঐ মানকে সব সময় শতকরা অনুপাতে প্রকাশ করতে হয় । যদিও অনেক (ে ত্রে ট্রান্সমিশন একটা গু(ত্বপূর্ণ বিষয়, তথাপি সেনসিটোমেট্রির (ে ত্রে ট্রান্সমিশনকে তত গু(ত্ব দেওয়া হয় না । কারণ, ট্রান্সমিশন কমার সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাকনেস বেড়ে যায় এবং এই পরিবর্তনের অনুপাত সমানভাবে হয় না ।

অপাসিটি—ট্রান্সমিশনের বিপরীত প্রতিত্রি(য়া অপাসিটি । নেগেটিভের উপর আপতিত আলো এবং নেগেটিভের মধ্যে দিয়ে প্রেরিত আলোর অনুপাত ।

অর্থাৎ $0 = \frac{I}{T} = \frac{Ii}{It}$

'O'-এর মান সবসময় 'একক' থেকে বেশি হবে । এবং 'O' বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাকনেস বেড়ে যায় । কিন্তু 'O' খুব নির্ভরযোগ্য পরিমাপক নয় । এবং বড় সংখ্যা নিয়ে কাজ করা 'O'-এর প(ে আরও জটিল । এছাড়াও 'O' ব্ল্যাকনেসের পরিবর্তনের সঠিক ছবি দিতে পারে না ।

ডেনসিটি—ডেনসিটি 'O' অপাসিটির লগারিদম ।

অর্থাৎ

সেনসিটোমেট্রিতে ব্ল্যাকনিন পরিমাপের একক হিসাবে 'D'-এর ব্যবহার 'O' -এর থেকে অনেক সুবিধাজনক । কারণ, 'D' ব্ল্যাকনিনের পরিবর্তনের সূক্ষ্মতম চিত্র আমাদের উপহার দিতে পারে । এই কারণেই সেনসিটোমেট্রিতে 'D' এর ব্যবহার খুব গু(ত্বপূর্ণ ।

স্বচ্ছ এবং অস্বচ্ছ দুই মাধ্যমের (ে ত্রেই ইমেজ সৃষ্টির জন্য ব্ল্যাকনিনের পরিমাপের একক হিসাবে 'D' -এর ব্যবহার করা হয়। তবে, অস্বচ্ছ মাধ্যমে ইমেজের (ে ত্রে প্রেরিত আলোর পরিমাণের বদলে প্রতিফলিত আলোর পরিমাণ অর্থাৎ ট্রান্সমিটেড ডেনসিটির বদলে রিফ্লেকটেড ডেনসিটি ব্যবহার করা হয় ।

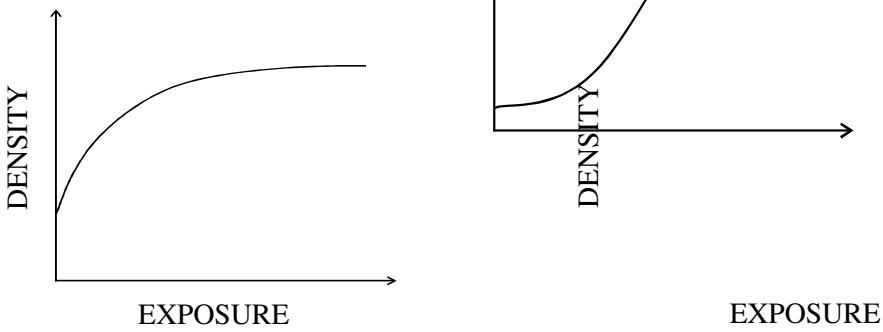

যে কোন একটা নেগেটিভ বি(ে-ষণ করলে আমরা দেখতে পাব আলো-ছায়ার মধ্যে রয়েছে একাধিক আলোর স্তরবিন্যাস। নেগেটিভের এই বর্ণস্তরকে আমরা যদি একটা 'লগচিত্র' দিয়ে প্রকাশ করি, তাহলে দেখা যাবে যে, এক্সপোজার বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে রেখাটা বাঁদিকের আলোকিত অংশ থেকে শু(করে ত্র(মে ডানদিকে সরতে সরতে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে একটা জায়গায় গিয়ে আবার নিম্নমুখী হয়ে গেছে ।

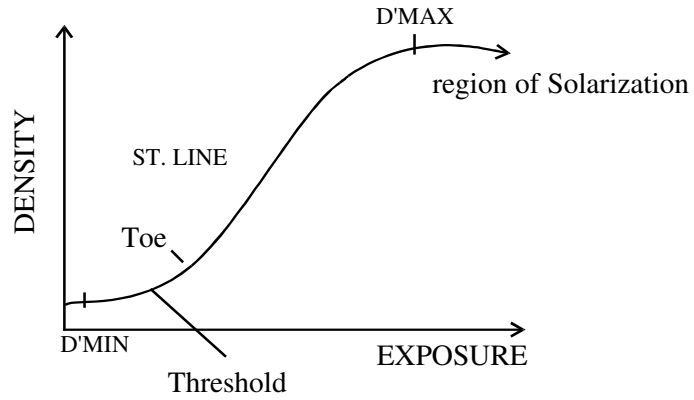

ক্যারেকটারিস্টিক কার্ভ বা নেগেটিভ যে বিন্দু থেকে ঘন হতে শু(করেছে সেই বিন্দুকে 'D' Min বা 'threshold' এবং threshold-এর পর যেখান থেকে রেখাটা সরল রূপ ধারণ করছে অর্থাৎ স্বীকৃত মাত্রার ঘনত্ব অংশকে স্পর্শ করছে, সেই অঞ্চলটা 'Toe' এবং toe-এর পর থেকে যেখানে রেখাটার সরলরূপ শেষ হয়েছে অর্থাৎ যেখানে ঘনত্ব স্বীকৃত মাত্রা অতিত্র(ম করছে সেই অঞ্চলটা পর্যন্ত অংশকে 'Straight line' এবং Straight line থেকে যে বিন্দুতে ঘনত্ব সর্বাধিক, সেই অঞ্চলটাকে 'Shoulder' এবং সর্বাধিক ঘনত্ববিন্দুতে 'D' Max' এবং -এর পর যেখান থেকে এক্সপোজার বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘনত্ব কমতে শু(করে সেই অংশকে বলে 'Solarization' অঞ্চল । অর্থাৎ 'Toe' কম 'Straight line' সঠিক এবং 'Shoulder' বেশি এক্সপোজার অঞ্চল । এবং 'D'Min' বা Threshold অঞ্চলের ঘনত্ব ন্যূনতম এবং Shoulder বা 'D'Max' -এর ঘনত্ব সর্বাধিক ।

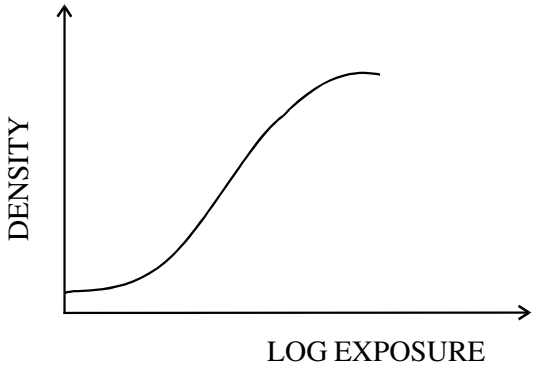

যেহেতু এক্সপোজারের স্বাভাবিক ত্র(মবৃদ্ধি জ্যামিতিক হারে হয়, তাই নেগেটিভের এই পরিবর্তনগুলি প্রকাশ করা বা দেখানোর জন্য একটা সাধারণ রেখাচিত্র থেকে 'লগ-রেখাচিত্র' অনেক বেশি সুবিধাজনক ও বৈজ্ঞানিক । কারণ, লগ রেখাচিত্র দিয়ে এক্সপোজার এবং ডেভেলপমেন্টের সূক্ষ্ম পরিবর্তনগুলি বি(-ষণ করা যায় ।

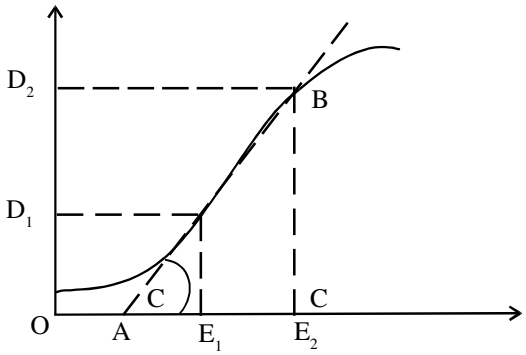

ডেভেলপমেন্টের সময় বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নেগেটিভের ডেনসিটি বেড়ে যায় । ডেভেলেপমেন্টের ডিগ্রি প্রকাশ করার জন্য 'গামা' ব্যবহার করা হয় । 'গামা' পরিমাপ করার পদ্ধতি—ক্যারেকটারিস্টিক কার্ভের সরলরেখা অংশের যে-কোন দুটো বিন্দু যোগ করে যদি রেখাটা 'Log E' রেখার সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়, তবে কোন $\angle \tan' C'$ -এর উদ্ভব হবে ।

অর্থাৎ

tan 'C' ৪৫°হলে—গামা ১ (এক) হবে ।

$$Gamma\ \gamma = \tan' C' = \frac{BC}{AC} = \frac{D_2 - D_1}{LogE_2 - LogE_1}$$

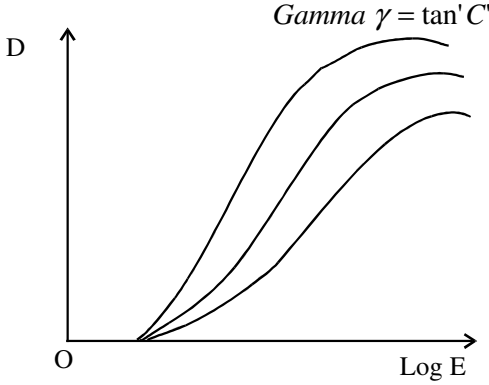

Point of Inertia

বিভিন্ন ঘনত্বের ক্যারেকটারিস্টিক কার্ভের সরলরেখা অংশকে যদি নিচের দিকে বাড়িয়ে 'Log E' রেখার সঙ্গে যোগ করে দেওয়া যায়, তবে রেখাগুলি একটা সাধারণ বিন্দুতে মিলিত হবে । এই সাধারণ বিন্দুকে বলে Point of inertia.

যেহেতু প্রত্যেক আধুনিক ডেভেলপারে 'Anti-fog regent' থাকে, ফলে ডেভেলপমেন্টের সময় বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে Inertia point উৎসের দিকে সরে যায় । এটাকে বলে inertia-র পশ্চাদ্‌গমন । এটা ঘটে ডেভেলপমেন্টের সময় বাড়ানো এবং ডেনসিটি বৃদ্ধির কারণে । এই (ত্রে কার্ভগুলির সরলরেখার বর্ধিত অংশগুলি 'Log E' রেখার নিচে একটা

D

O

Point of confluence Log E

নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হবে, যার নাম Point of confluence।

ডেভেলপমেন্টের সময় বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে 'গামা' পরিবর্তন হয় বলে আমরা একটা 'Gamma development time curve' এঁকে উভয় সম্পর্কের বিষয়ে সচেতন হতে পারি । শু(তে ডেভেলপমেন্টের সময় বাড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে গামা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায় । তারপর আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে, যত(ণ না গামা 'Infinity'-তে পৌঁছায় । গামা ইনফিনিটি পর্যন্ত ডেভেলপ করলে নেগেটিভ 'Fag' এবং গ্রেণী হয়ে যায় । বিভিন্ন ইমালশানের বিভিন্ন গামা ইনফিনিটি থাকে । এবং এটা ডেভেলপারের প্রকৃতির উপরেও নির্ভর করে ।

ক্যারেকটারিস্টিক কার্ভের থেকে আমরা ইমালশানের উপর এক্সপোজার এবং ডেভেলপমেন্টের প্রতিত্রি(য়ার বিষয়ে জানতে পারি । একটা নেগেটিভের সম্পূর্ণ পরিসর এক্সপোজ করা যায় না । এটা নির্ভর করে বিষয়বস্তুর ঔজ্জ্বল্যের পরিসরের উপর।

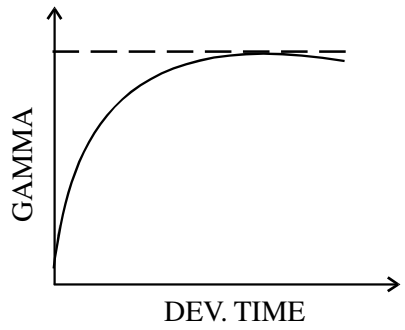

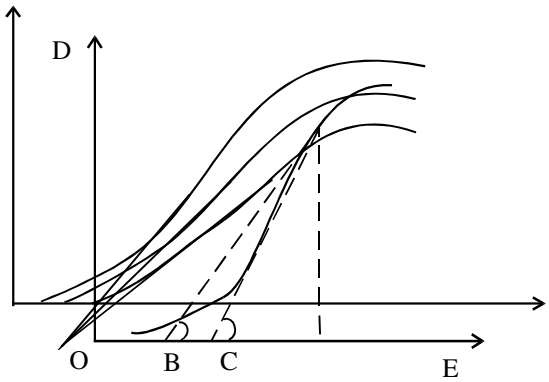

সাধারণত একটা নেগেটিভ 'টো' এবং 'সরলরেখা' অংশের কিছুটা স্পর্শ করে । সে(ত্রে ইমালশানের কনট্রাস্টের সম্পূর্ণ নতুন একটা পরিমাণগত সম্পর্ক জানতে পারি । যাকে বলা হয় 'Average gradient' এবং 'Average gradient' পরিমাণ আমরা জানতে পারব, যদি 'টো' এবং 'সরলরেখা' অংশের দুটো সীমাবদ্ধ বিন্দু যোগ করে রেখাটা Log E রেখার সঙ্গে যুক্ত(করলে যে নুতন কোণ হবে তা পরিমাপ করি। এটা অবশ্য সব সময় Tan 'C' -এর থেকে কম হবে । এটাকে $\overline{G}$ (জি বার) বলা হয়, এবং Tan 'B' দিয়ে প্রকাশ করা হয় ।

নেগেটিভের উপর ডেভেলপমেন্টের প্রভাব অনুধাবনের জন্য একইভাবে এক্সপোজ করা অথচ তিন রকম ভাবে

ডেভেলপ করা, অর্থাৎ একটা সঠিক এবং অন্য দুটো একটা কম, একটা বেশি ডেভেলপ করে তিনটে নেগেটিভ বি(েষণ করতে হবে ।

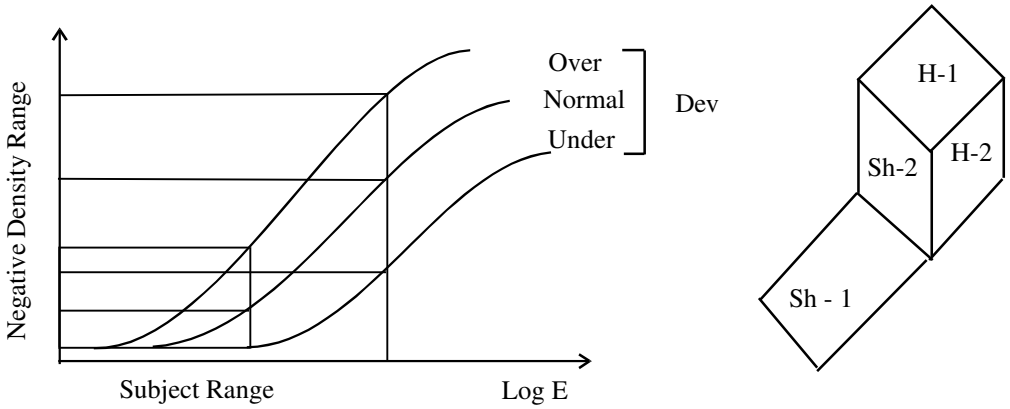

ল(্য করলে দেখা যাবে—ডেভেলপমেন্টের সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেগেটিভের ঘনত্ব বেড়েছে কিন্তু ঘনত্ব বাড়ার গতি ডেভেলপমেন্টের সময় বাড়ানোর সঙ্গে সমান হয়নি । আমরা আরও দেখতে পাব যে, ওভার-ডেভেলপ করা নেগেটিভের 'হাইলাইট' অংশের পরিসর 'শ্যাডো' অংশের পরিসরের থেকে অনেক বড় বা দীর্ঘ । এবং স্বাভাবিক ডেভেলপ করা নেগেটিভের ঘনত্বের মধ্যে সুন্দর সমতা আছে । কিন্তু কম ডেভেলপ করা নেগেটিভের ঘনত্ব স্বাভাবিক ঘনত্বের থেকে কম এবং শ্যাডো অংশের ঘনত্ব প্রায় নেই ।

অনুরূপভাবে সঠিক ডেভেলপমেন্টে এবং তিন রকমভাবে এক্সপোজড অর্থাৎ একটা সঠিক, অন্য দুটো কম এবং বেশি এক্সপোজড নেগেটিভ বি(েষণ করলে আমরা নেগেটিভের উপর এক্সপোজারের প্রতিক্রি(য়া বিষয়ে জানতে পারব ।

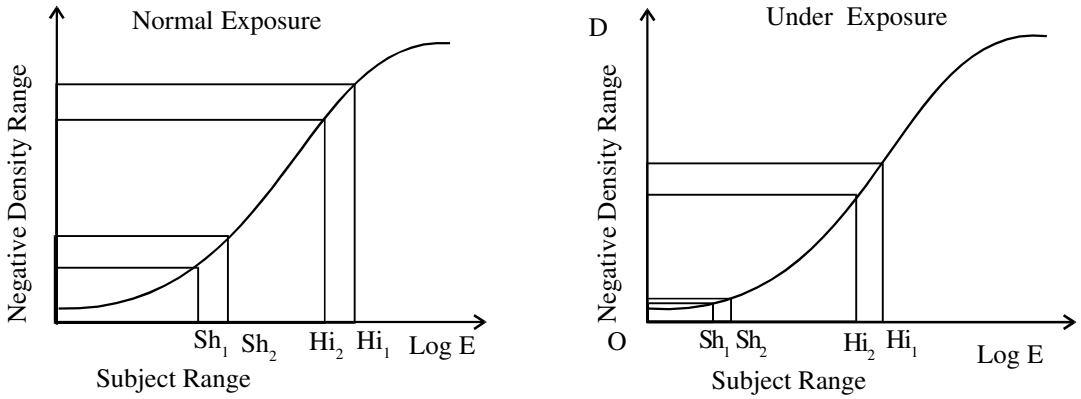

কম এক্সপোজড করা নেগেটিভের ঘনত্বের পরিসর ছোট এবং বেশি এক্সপোজড করা নেগেটিভের ঘনত্বের পরিসর বড়।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো খুব বেশি এক্সপোজড করা নেগেটিভের (ে ত্রে ঘনত্বের পরিসর সংকুচিত হয় । হাইলাইট থেকে শ্যাডো অংশ বড় হয় । অনেকটা হাইলাইটের ডিটেল পাওয়া যায় না । স্বাভাবিক কারণেই কম এক্সপোজড করা নেগেটিভের শ্যাডো অংশের পরিসর খুব কম । ফলে, শ্যাডো ডিটেল কম থাকে। তাই শ্যাডো ডিটেল পাওয়ার জন্য সব

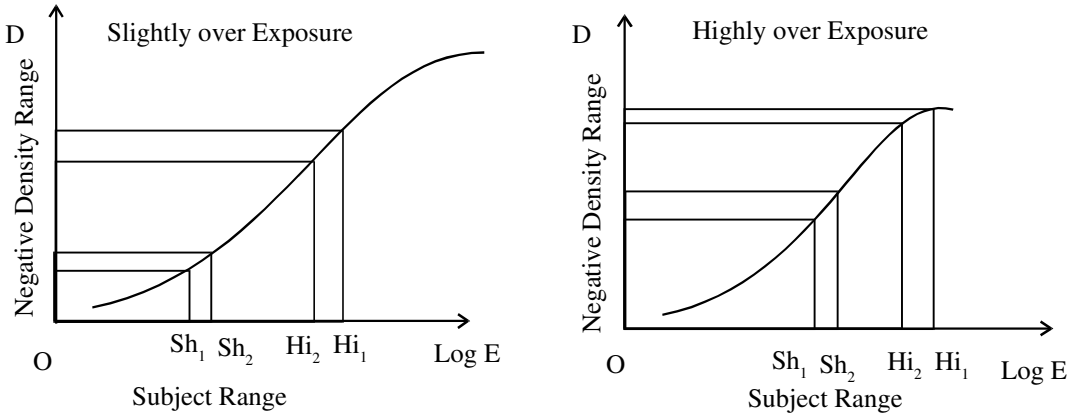

সময় একটা ন্যূনতম এক্সপোজার ব্যবহার করতে হয় । ফিল্মের একটা বৈশিষ্ট্য ফিল্ম ল্যাটিচুড । ফিল্ম ল্যাটিচ্যুড নির্ভর করে ইমালশানের প্রকৃতির উপর । ল্যাটিচ্যুড ফিল্মের এমনই এক বিশেষ (মতা, যদি আলো-ছায়ার সমতা থাকে, তবে ন্যূনতম সঠিক এক্সপোজার ব্যবহার করলে একই সঙ্গে হাইলাইট ও শ্যাডো ডিটেলের বিশেষ (তি হয় না ।

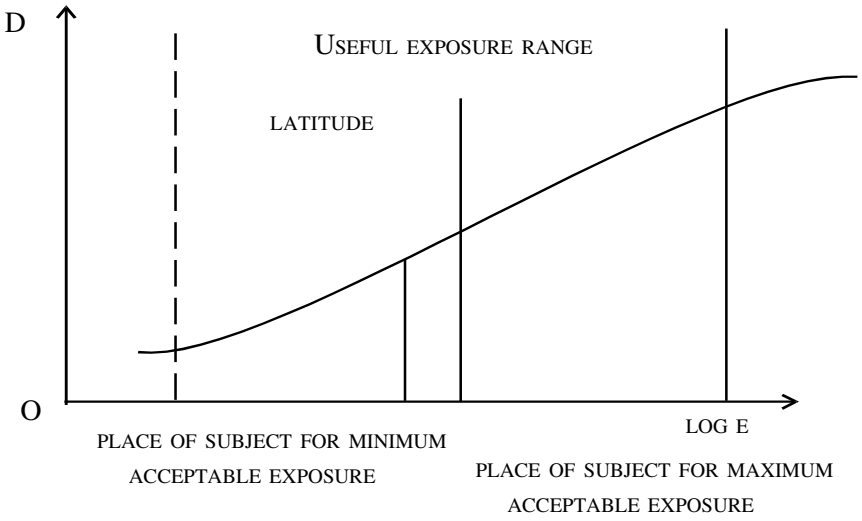

কোন নেগেটিভের ঘনত্বের সর্বাধিক এবং সর্বনিম্ন বিন্দু অর্থাৎ D' Max এবং D' Min -এর পার্থক্য হলো ব্যবহারযোগ্য এক্সপোজার অঞ্চল (Useful exposure range) ।

এক্সপোজার ল্যাটিচ্যুড এবং ব্যবহারযোগ্য এক্সপোজার অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে ফিল্ম ইমালশান এবং ডেভেলপারের প্রকৃতি। ব্যবহারযোগ্য এক্সপোজার অঞ্চল নির্ভর করে বিষয়বস্তুর ঔজ্জ্বল্যের পরিসরের উপর । সাধারণত, সাধারণ বিষয়বস্তুর ঔজ্জ্বল্যের পরিসর ব্যবহারযোগ্য এক্সপোজার অঞ্চলের কম হয় । যদি তা না হয়, তবে কোন এক্সপোজার ব্যবহার করেই একই সঙ্গে বস্তুর শ্যাডো এবং হাইলাইট ডিটেল বজায় রাখা যাবে না । যদি বস্তুর ঔজ্জ্বল্যের পরিসর ব্যবহারযোগ্য এক্সপোজার অঞ্চলের কম হয়, আয়ত্তে থাকে, তবে এমন এক্সপোজার ব্যবহার করা উচিত যাতে বস্তুর সমস্ত ঔজ্জ্বল্যের

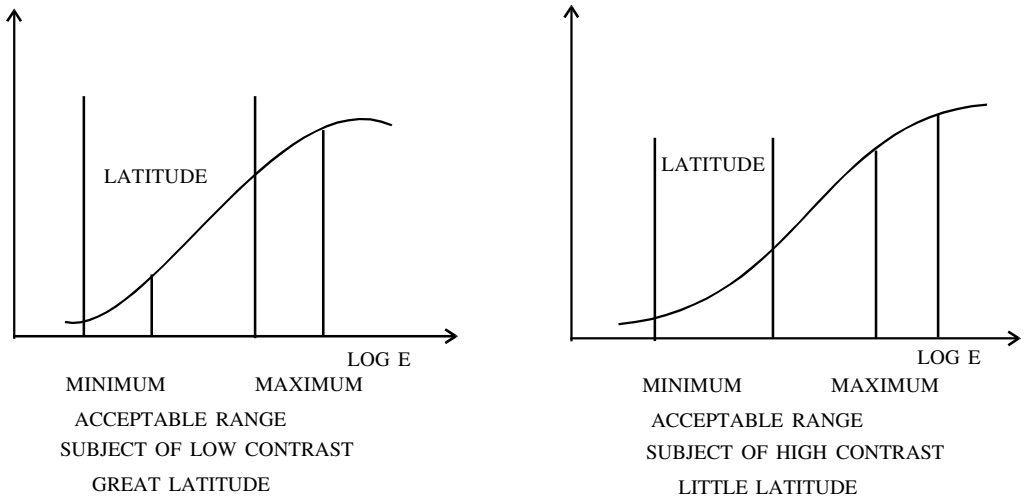

পরিসর ক্যারেকটারিস্টিক কার্ভের সরলরেখা পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । যার ফলে পাওয়া যাবে আলো-ছায়ার বৈষম্যসহ আদর্শ বাঞ্ছিত নেগেটিভ।

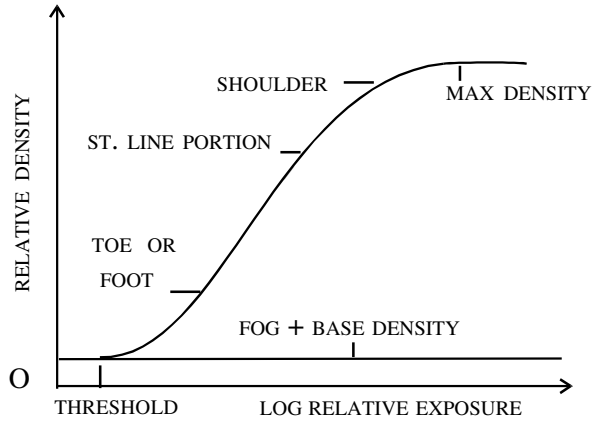

আগেই বলা হয়েছে ক্যারেকটারিস্টিক কার্ভের সাহায্যে অস্বচ্ছ মাধ্যম অর্থাৎ ফোটোগ্রাফিক পেপারের ঘনত্বও পরিমাপ করা যায় । এই ে(ত্রে গাণিতিকভাবে প্রতিফলিত ঘনত্ব (Reflection density) প্রকাশ করা হয় । $D = \text{Log } {}^{1}/_{R}$ যেখানে 'R' প্রতিফলিত উৎপাদক, ডেভেলপ করা কাগজের প্রতিফলিত আলো এবং বস্তুর প্রতিফলিত আলোর অনুপাত ।

নেগেটিভ ক্যারেকটারিস্টিক কার্ভের মতো এই কার্ভেরও পাঁচটি ভাগ আছে । ১। Zero gradient, ২। Toe, ৩। Straight line portion, ৪। Shoulder, ৫। Maximum density region। এই মিল থাকা সত্ত্বেও উভয় কার্ভের মধ্যে কিছুটা পার্থক্যও আছে । অস্বচ্ছ বস্তুর কার্ভের সরলরেখা অংশ খুবই ছোট । কারণ 'টো' বেশি ঘনত্বের দিকে প্রসারিত হয় এবং সোলডার শু(হয় সর্বনিম্ন ঘনত্ব থেকে । এছাড়াও অস্বচ্ছ মাধ্যমের কার্ভের ঘনত্বের ত্র(মবৃদ্ধির গতি নেগেটিভ কার্ভের গতির থেকে একটু বেশি ।

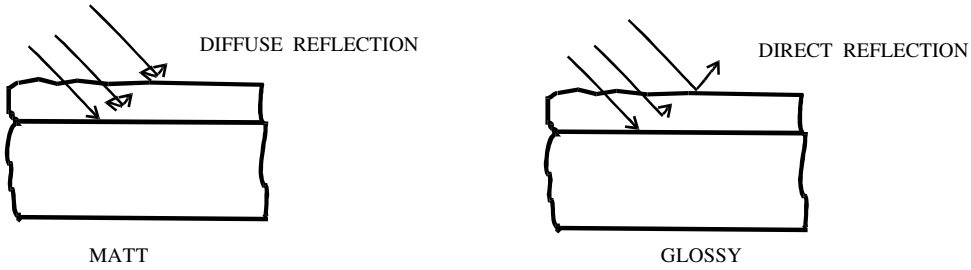

ফোটোগ্রাফিক কাগজ থেকে তিনভাবে আলো প্রতিফলিত হয় । ১। কাগজের জিলোটিন লেয়ার থেকে, ২। কাগজের ইমালশান লেয়ার থেকে, ৩। কাগজের তল থেকে । কাগজের আলো প্রতিফলন (মতা নির্ভর করে কাগজের উপরিভাগের প্রকৃতি এবং ইমালশানের চরিত্রের উপর । ফলে ভিন্ন ভিন্ন কাগজের ক্যারেকটারিস্টক কার্ভও আলাদা ।

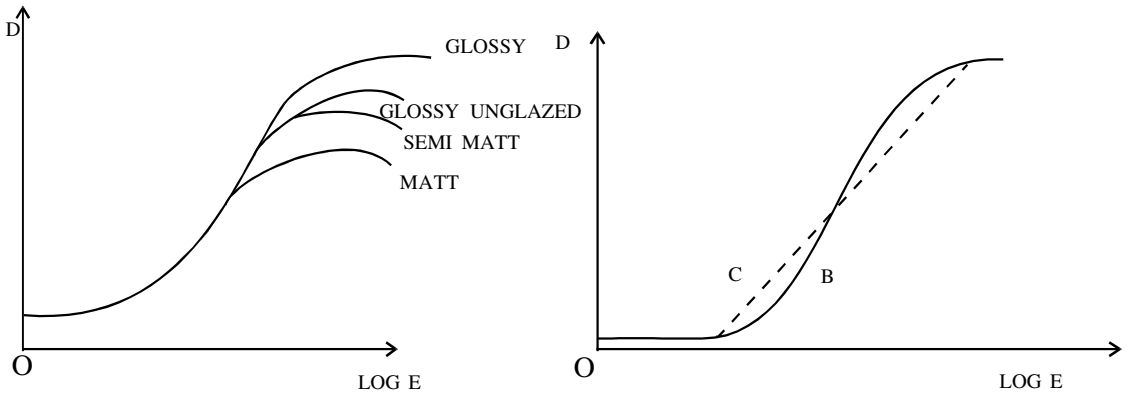

উপরিভাগ (Surface) অনুযায়ী কাগজ চার রকম ঃ—

Surface	Reflection density
১। Glossy-glazed	2.10
২। Glossy-unglazed	1.85
৩। Semi-matt	1.65
৪। Matt	1.30

ইমালশানের চরিত্র অনুযায়ী কাগজ তিন রকম ঃ— ১। Bromide, ২। Chloride, ৩। Chloro-bromide। এই কাগজগুলির ে ত্রে এক্সপোজার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডেনসিটি বাড়ার হার কিন্তু একই রকম নয় । ক্লোরাইড কাগজের ে ত্রে এক্সপোজারের সমহারে ডেনসিটি বাড়ে । কিন্তু ব্রোমাইড কাগজের ে ত্রে ক্লোরাইড কাগজের তুলনায় প্রথমে

ডেনসিটি বাড়ে আস্তে আস্তে। তারপর খুব তাড়াতাড়ি এবং পরে আবার আস্তে-আস্তে। ফলে, ক্লোরাইড কাগজ শ্যাডো এবং হাইলাইটের সব বর্ণবিন্যাসের স্তরগুলো প্রিন্টে ফুটিয়ে তুলতে পারে । ক্লোরো-ব্রোমাইডের চরিত্র এর মাঝামাঝি ।

ফোটোগ্রাফিক কাগজের উপর ডেভেলপমেন্টের প্রতিক্রি(য়া কিন্তু নেগেটিভ থেকে আলাদা । এবং বিভিন্ন ধরনের কাগজের উপর ডেভেলপমেন্টের প্রতিক্রি(য়াও আলাদা আলাদা । যে কোন কাগজই খুব বেশি সময় ডেভেলপ করলে 'ফগ' হয়ে যাবে। এবং খুব কম ডেভেলপ করলে পূর্ণ কালো বর্ণ (Maximum black tone) পাওয়া যাবে না । এই কারণে আমাদের ভাবতে হবে 'ডেভেলপমেন্ট ল্যাটিচ্যুড'-এর কথা । সব থেকে বেশি এবং কম ডেভেলপমেন্টের সময়ের পার্থক্য। যার ফলে আমরা একই সঙ্গে পেতে পারি ফগহীন পূর্ণ কালোবর্ণ । সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে কম ডেভেলপমেন্টের সময় এবং এক্সপোজার 'সময়ে'র অনুপাতকে বলে Printing exposure latitude । যেহেতু ডেভেলপমেন্ট ল্যাটিচ্যুড এবং এক্সপোজার ল্যাটিচ্যুড পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই একই সঙ্গে উভয়ের সুবিধা পাওয়া যাবে না । ফলে, এক্সপোজার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্টের বাঞ্ছিত ডেভেলপমেন্টের সময় নির্ধারিত হয়ে যায় ।

প্রিন্টের প্রয়োজনীয় আকাঙ্ি(ত বিষয় ঃ—

১। নেগেটিভের সব গু(ত্বপূর্ণ বর্ণ প্রিন্টে থাকবে,

২। প্রিন্টের সাদা-কালো এবং রঙের মধ্যে মধ্যে পূর্ণ বর্ণবিন্যাস থাকবে ।

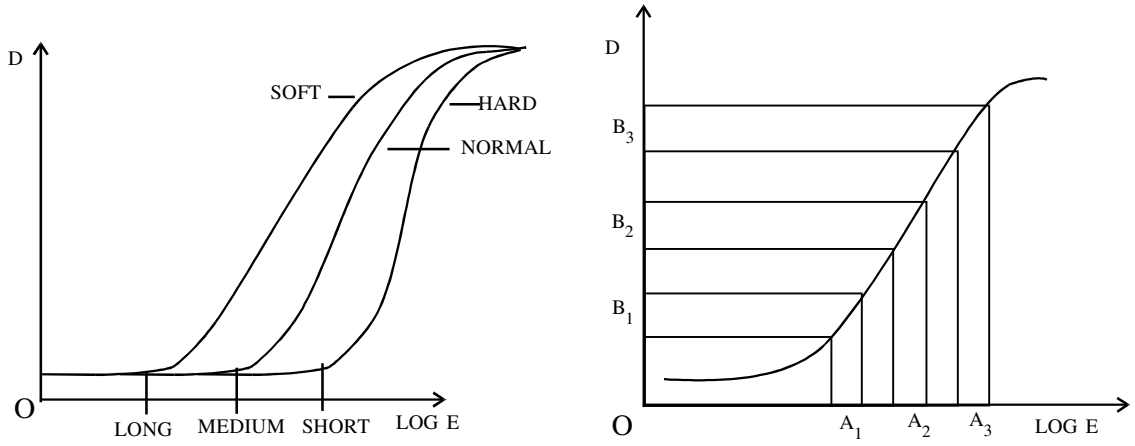

প্রিন্টিঙের ে(ত্রে নেগেটিভের ঘনত্ব এক্সপোজার নির্ধারণ করে । ঘন বা পু(নেগেটিভের জন্য বেশি এবং পাতলা নেগেটিভের জন্য কম এক্সপোজার প্রয়োজন হয় । যেহেতু সব নেগেটিভের ঘনত্বের পরিসর এক নয়, তাই ছবির প্রিন্টের পূর্ণাঙ্গ রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য ভিন্ন-ভিন্ন ঘনত্ব পরিসরযুক্ত(কাগজও তৈরি করা হয়েছে । অনেক সময় কাগজগুলির তলা বা Surface এক রেখে Contrast grade, আলো-ছায়ার বর্ণবৈষম্যের স্তর আলাদা কিংবা Surface এবং Contrast grade দুটোই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তৈরি করা হয় । তবে, যেভাবেই তৈরি হোক না কেন, Contrast grade অনুযায়ী কাগজগুলি সাধারণত ১। Normal, ২। Soft, ৩। Hard এই নামে পরিচিত । আবার Special grade -ও আছে । কাগজগুলির বৈশিষ্ট্য হলো, প্রত্যেক গ্রেডের কাগজের ে(ত্রে একটা নির্দিষ্ট এক্সপোজার দিয়ে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ডেভেলপ করলে ক্যারেকটারিস্টিক কার্ভের একটা 'কমন বিন্দু'-তে পূর্ণ কালোবর্ণ পাওয়া যাবে । কিন্তু প্রতিটা কাগজের বর্ণবৈষম্যের পার্থক্য বিস্তর । প্রতিটা কাগজ সমপরিমাণ বর্ণস্তর ফুটিয়ে তুলতে পারে না । কাগজের মান যখন Soft থেকে Hard-এর দিকে যায়, তখন কার্ভের খাড়া ভাব (Steepness) বাড়ে, এক্সপোজার রেঞ্জ কমে আসে । ফলে প্রিন্টের পূর্ণাঙ্গ রূপ ফুটিয়ে

তুলতে Soft নেগেটিভের জন্য Hard কাগজ এবং বিপরীতত্র(মে Hard নেগেটিভের জন্য Soft কাগজই ব্যবহার করতে হয়।

প্রিন্টিঙের উদ্দেশ্য বিষয়বস্তুর বিভিন্ন উজ্জ্বল পরিসর, বর্ণস্তরের সঠিক চিত্ররূপ সৃষ্টি করা । প্রিন্টের বিভিন্ন অংশের আলোর প্রতিফলনের সঙ্গে মূল বিষয়বস্তুর ঔজ্জ্বল্যের সম্পর্কই 'টোন রিপ্রোডাকশন' । হার্টার এবং ড্রাইফিল্ড প্রথম এই বিষয়ে আলোকপাত করেন । তাঁরা বলেছিলেন, সঠিক রিপ্রোডাকশনের জন্য এমন এক্সপোজার নির্ধারণ করতে হবে, যাতে বিষয়বস্তুর ঔজ্জ্বল্যের পরিসর সব স্তরগুলি ক্যারেকটারিস্টিক কার্ভের গ্রহণযোগ্য, ব্যবহারযোগ্য অংশের মধ্যে থাকে । এবং নেগেটিভ কখনই **১.০** গামার বেশি ডেভেলপ করা চলবে না ।

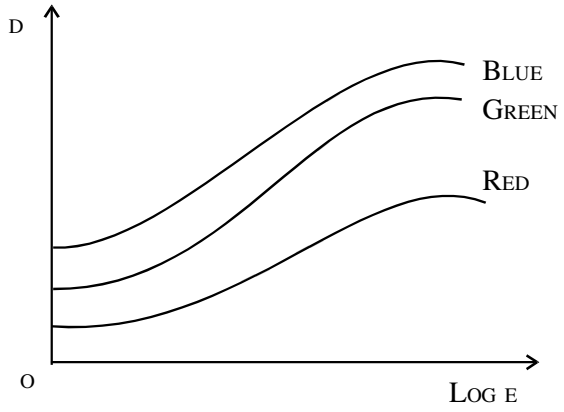

রঙিন ইমালশানের সেনসিটোমেট্রি অনুধাবনের জন্য উপলব্ধি করতে হবে রঙিন ফিল্মের ইমালশান এবং নেগেটিভের গঠন বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র । প্রাথমিক লাল, নীল ও সবুজ এই তিনরঙের ভিন্ন ভিন্ন ইমালশান স্তরের সমন্বয়ে তৈরি রঙিন নেগেটিভ এবং পজিটিভ ফিল্ম । ফলে, এক্সপোজ করার সঙ্গে-সঙ্গে তিনটে ভিন্ন রঙের ইমালশান তিনভাবে সত্রি(য় হয় । কারণ, লাল, নীল, সবুজ রঙের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, এবং আলো প্রতিফলন (মতা অভিন্ন না। সেই সঙ্গে ইমালশানের সত্রি(য়তাও আলাদা আলাদা। ফলে একই নেগেটিভ এবং পজিটিভে তিনটে আলাদা আলাদা ক্যারেকটারিস্টিক কার্ভ সৃষ্টি হয় । যাদের চরিত্র এবং সত্রি(য়তা আলাদা । অনেকটা সাদা-কালো ফিল্মের (ে ত্রে তিনরকমভাবে এক্সপোজড করে সঠিক ডেভেলপ করা নেগেটিভের মতো । কিন্তু আশ্চর্য মজার ব্যাপার হলো রঙিন নেগেটিভের (ে ত্রেও রসায়নাগার বাঞ্ছিত ঘনত্ব 'LAD' (Lab Aim Density) ১.০'।